অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 12 - 2024

বেদান্ত দর্শন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত

ডঃ টুসি ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 12 originally published online November 2024

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2024 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.12 : 2024 | **ISSN 2347-8055**

বেদান্ত দর্শন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত

ডঃ টুসি ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ

সংক্ষিপ্তসার

আমাদের জীবনের বহু ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। বিভিন্ন ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তবে তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের ধারণার অনেক উর্দ্ধে। তিনি বেদান্ত দর্শনকে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা ছিল এবং তিনি কিভাবে তার প্রায়োগিক দিকটি দেখিয়েছেন তা আমি বেদান্তদর্শনে কি বলা রয়েছে তা অল্প বলে নিয়ে তারপর আলোচনা করে দেখিয়েছি, আমার 'বেদান্ত দর্শন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত' নামক প্রবন্ধে। স্বামীজী তাঁর কর্মময় জীবনের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ রূপে বিবেচনা করেছিলেন। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ছিল তাঁর জীবনে ভাবনার একটি মূল উপাদান। সে যুগে বেদান্ত দর্শন চর্চা করা হলেও তার প্রচার ব্যাপকভাবে করা হয়নি। কিন্তু তিনি তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শন প্রচারের জন্য তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। এইভাবে বেদান্ত প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছতে পেরেছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বেদান্ত দর্শন প্রচারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা। তাই আমাদের চৈতন্যকেও জাগ্রত করতে তিনি অদ্বৈত বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করার কথা বলেছেন। ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য না রেখে বেদান্তদর্শনকে তিনি কার্যকরী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বেদান্ত দর্শনকে বিশ্বমানবের সাধনার পটভূমিরূপে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। আমি এই প্রবন্ধে প্রথমে বেদান্ত দর্শনে কি বলতে চাওয়া হয়েছে তা অল্প বলে তারপর দেখিয়েছি তিনি কীভাবে তাত্ত্বিক দিক থেকে বেদান্ত দর্শনকে বুঝেছিলেন এবং তারপরে দেখিয়েছি শুধু তাত্ত্বিক দিকই নয়, তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক দিকের কথাও চিন্তা করেছিলেন। পরিশেষে বলব, তিনি বেদান্ত দর্শনের আলোচনার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির উন্নতির পথনির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বেদান্তকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে তাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, তার সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

বেদান্ত দর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শন সমূহের অন্যতম। বেদান্তদর্শন উপনিষদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ হল বেদের অন্ত। উপনিষদ হল বেদের অন্ত। নানা অর্থে উপনিষদকে বেদের অন্ত বলা যায়। উপনিষদ বেদের শেষ ভাগে রচিত। তাই উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদান্ত দর্শন হল উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা। সমস্ত উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্ম। মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদের মর্ম সূত্রের আকারে গ্রথিত করেছিলেন, তার নাম হল ব্রহ্মসূত্র। এই ব্রহ্মসূত্রের ওপর অনেক ভাষ্য ও টীকা রচিত হয়েছিল।

তার মধ্যে একটি হল শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্য। শঙ্করাচার্যের দর্শন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন নামে পরিচিত। এছাড়াও ব্রহ্মসূত্রের ওপর নানান দার্শনিক নানাবিধ ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মময় জীবনের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন প্রচারকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ রূপে বিবেচনা করেছিলেন। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ছিল তার জীবনে ভাবনার একটি মূল উপাদান। সেই যুগে আমাদের দেশে বেদান্ত দর্শন চর্চা করা হলেও তার প্রচার ব্যাপকভাবে করা হয়নি। যদিও রামমোহন রায় বেদান্ত দর্শন প্রচার করেছিলেন, তবে বিবেকানন্দ তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শন প্রচারের জন্য তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। এইভাবে বেদান্ত প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছতে পেরেছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বেদান্ত দর্শনের প্রচারে বিবেকানন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূলতত্ত্ব ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা। তাই আমাদের চৈতন্যকেও জাগ্রত করতে তিনি অদ্বৈত বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করার কথা বলেছেন। ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য না রেখে বেদান্তদর্শনকে তিনি কার্যকরী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই পূর্বে যা ধারণা ছিল তাতে তিনি নতুন মাত্রা সংযোজন করে বলেছিলেন,

> "অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে — এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল — বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।..."[১]

এইভাবে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন বেদান্ত দর্শনের মধ্যেই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে। তাই তাঁর ভাষায়,

> "বেদান্ত এক বিশাল পারাপার বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধ জাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক — সকলেই সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান"[২]

এইভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তকে বিশ্বমানবের সাধনার পটভূমিরূপে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আমি বর্তমান প্রবন্ধে প্রথম অনুচ্ছেদে দেখাবো তিনি কীভাবে তাত্ত্বিক দিক থেকে বেদান্ত দর্শনকে বুঝেছিলেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখাবো শুধু তাত্ত্বিক দিকই নয়, তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক দিকের কথাও চিন্তা করেছিলেন।

বেদের তাৎপর্যকেই বেদান্ত বলা হয়। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী বেদান্তিকগণ সকলেই তাঁকে অনুসরণ করে বেদের তাৎপর্য অর্থেই বেদান্ত শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বেদের তাৎপর্যকেই বেদান্ত শব্দের

দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে যা বেদের চরম লক্ষ্য তাই-ই বেদান্ত। তিনি বেদান্তের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন "যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে তবে সেই সম্প্রদায়কে সনাতন মতাবলম্বী বলে স্বীকার করিতে পারা যায় না। ...জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উৎস।"[৩] অদ্বৈত বেদান্তে সৎ বলতে ত্রিকালে অবাধিত পারমার্থিক সৎকেই বোঝানো হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'যে অর্থ বা বস্তু একরূপে থাকে তাই পারমার্থিক সৎ'[৪]। এইদিক থেকে দেখতে গেলে ব্রহ্মই হল একমাত্র পারমার্থিক সৎ। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন, পরিণাম ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় না। তাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ। এই ব্রহ্ম কখনো ভাষা ও বুদ্ধির বিষয় হতে পারে না। কিন্তু এই পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মকে যদি আমাদের বোঝবার বিষয় করতে হয় তখন তাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ রূপেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি শব্দ আবার অভাবের সূচকরূপেও ব্রহ্মের স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে। সৎ অর্থে অসৎ নয়, চিৎ অর্থে অচিৎ জড় নয়, এবং আনন্দ অর্থে দুঃখস্বরূপ নয়। এইভাবে নেতি নেতি ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম"[৫], আরো বলেছেন, "জীব ও ব্রহ্ম যে এক সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন... আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা, এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ..."[৬]। তবে বিবেকানন্দের মতে সচ্চিদানন্দরূপ লক্ষণটি ব্রহ্মের চরম লক্ষণ নয়। তিনি বলেন, "সচিদানন্দ সংজ্ঞায় ব্রহ্মকে আংশিকভাবে প্রকাশ করা হয়।"[৭] এখানে আংশিকভাবে কথাটির দ্বারা লক্ষণা নামক গৌণী বৃত্তির সাহায্যে সৎ, চিৎ আনন্দ বলতে মিথ্যা নয়, জড় নয়, দুঃখাত্মক নয় এমন অভাবাত্মক অর্থ করে থাকেন। অর্থাৎ পরমার্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের বক্তব্য অদ্বৈত বেদান্তের বক্তব্যের অনুরূপই। বিবেকানন্দ বলেন ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। 'স্বপ্রকাশ জ্ঞান বা চৈতন্য কখনোই জড়ের ধর্ম হতে পারে না। ...চৈতন্যই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই শরীর স্বপ্রকাশ নয়... যা স্বপ্রকাশ, তাহার কখনও ক্ষয় হয় না। ...উহা স্বপ্রকাশ"[৮]। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বে বলা হয়েছে, আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, বাক্যের অগোচর, প্রমাণকে সিদ্ধ করে। এই আত্মা বিশ্বকে প্রকাশিত করলেও নিজে কখনো প্রকাশিত হয় না। তবে ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জগতের ভিতরে জীবরূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'তিনি কামনা করলেন বহু হব, প্রজাত হব। তিনি তপস্যা করে এই যা কিছু সবই সৃষ্টি করলেন। তা সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন"[৯] ব্রহ্মই জগতে প্রবিষ্ট হয়ে জীব হয়ে বা প্রত্যাগাত্মা হয়ে আছেন। মন, প্রাণ, উপাধি সহযোগে তিনি জীবাত্মা বলে অভিহিত হলেও স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মই। তাই উপনিষদে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'[১০]-র মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে। এইভাবে শ্রুতির মধ্যে দিয়েই অদ্বৈত বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ দেখানো হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়োজনে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হতে বিকশিত বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। তাই তিনি বলেছেন, "একটি মাত্র বস্তু আছে—তা নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে"""" অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম-রূপ-উপাধিবশত বহু প্রতীত হইতেছে।"[১১] তবে তিনি প্রকৃতিকে মায়া বলে জানার কথা বলেছেন এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলেছেন। শঙ্করাচার্যও জগতের কারণরূপে ঈশ্বরের কথাই বলেছেন।[১২] অদ্বিতীয়,

অখণ্ড, ব্রহ্ম — হতে মায়া দ্বারা, আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা জীবজগৎ হয়। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন — "সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্যে দিয়ে দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। মায়া অধীনস্ত নির্গুণ ব্রহ্ম জীবাত্মা এবং মায়াধীশ প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে নির্গুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর বা স্বগুণ ব্রহ্ম"[১৩] তিনি আরো বলেছেন, "সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণস্বরূপ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্ত্রা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।"[১৪] আবার তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই।"[১৫] ছান্দোগ্য উপনিষদেও এমন কথা লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বলা হয়েছে "সৎ শব্দ বাচ্য ঈশ্বরই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নামরূপ করলেন।"[১৬] তাই যা জীবের ব্যক্তিত্ব, তা ঈশ্বরেরই ব্যক্তিত্ব। এইভাবে দেখা যায় অদ্বৈত বেদান্তে যা বলা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় তার অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

তবে মায়ার লক্ষণ দিতে গিয়ে বেদান্তসার গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপং, যৎকিঞ্চিৎ ইতি।"[১৭] এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে মায়া অনির্বচনীয় — অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বা ভিন্নরূপে নির্বচনের অযোগ্য তা বলা হয়েছে। বা মায়া সৎ ও অসৎরূপে নির্বচনের অযোগ্য। এই মায়াকে আবার অঘটন-ঘটন পটীয়সীও বলা হয়েছে। মায়া সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণাত্মিকা, মায়ার দুই প্রকার শক্তি আছে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। এটি কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে... অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন,... অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হয়েও আমরা ভাবি, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহ মাত্র, এটিই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল"[১৮]। অর্থাৎ এখানে তিনি আত্মাতে বা ব্রহ্মে জীবত্ব সম্ভাবনা হয়, তার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে আত্মা স্বরূপত অসীম হয়েও তাকে ক্ষুদ্র বলে মনে করি একথাই বললেন। 'প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যাত্ম জগৎ-ই ব্রহ্ম। আমরা যে তা ভিন্ন বলে মনে করছি এরই নাম মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান।"[১৯] গীতায়ও অজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মহ্যন্তি জন্তবঃ'[২০] অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকাতে মানুষেরা মোহ প্রাপ্ত হয়। এছাড়া বেদেও বলা হয়েছে 'মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'[২১] অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেছেন। তবে অদ্বৈত বেদান্ত মতে মায়া অভাবমাত্র নয়। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয় — ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা;... এজন্য বেদান্তদর্শনে ইহাকে "অনির্বচনীয়" অর্থাৎ "বাক্যদ্বারা অপ্রকাশ্য" বলা হইয়াছে।[২২] এছাড়াও ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে বস্তু যা নয়, তাকে সেইরূপে প্রতীতি করাই হল অধ্যাস। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য কিন্তু আমরা জগৎকে সেভাবে দেখছি না। বিবেকানন্দও বলেছেন, "অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ।।"[২৩] তিনি অন্য একটি স্থানে মায়া সম্পর্কে বলেছেন, "দেশ কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি। ...প্রকৃতিই মায়া। যে নাম ও রূপে প্রত্যেক বস্তুকে ঢালা হয়, তাহাকে 'মায়া' বলে। মায়া সত্য নয়, মিথ্যা। মায়া সত্য হইলে ইহাকে আমরা বিনাশ অথবা পরিবর্তন করিতে পারিতাম না।"[২৪] অবিদ্যা দ্বারা যে নাম রূপকে জানি তাই যে মায়া এটি শঙ্করাচার্য্যেরও বক্তব্য। তবে উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দ এখানে মায়াকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি আবার বহুবার বলেছেন মায়া illusion

নয়। তবে বৌদ্ধরা যে অর্থে illusion বলতে অলীক বা শূন্য বা নিরধিষ্ঠান ভ্রম অর্থ করেন, অদ্বৈত বেদান্ত মতে মায়া সেরকম illusion নয় — এটিই ছিল বিবেকানন্দের বক্তব্য। তাঁর মতে, "আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র।"[২৫] শঙ্করাচার্যের মতেও ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য হলেও এবং জগৎ মিথ্যা হলেও ব্যবহারে সেটি যেমন দেখা যায়, তা মানতেই হবে। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিও বেদান্ত বহির্ভূত নয়। বেদান্ত সিদ্ধান্তেরই অভিনব ভাবে উক্তি। এখানে মায়ার কার্যের দ্বারাই মায়াকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ জীবাত্মা প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রতিটি মন এবং প্রতিটি দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা তাহাকেই বলে জীবাত্মা।"[২৬] তিনি আরো বলেছেন, "সকল জীবাত্মা অনাদি, অনন্ত, স্বরূপতঃ অবিনাশী।"[২৭] এছাড়াও বলেছেন, "যদিও সূর্য লক্ষ লক্ষ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়, প্রতি জলবিন্দুতে সূর্যের সম্পূর্ণ আকৃতি বা ছায়া পড়ে, কিন্তু সেগুলি শুধু ছায়া বা আকৃতি, প্রকৃত সূর্য মাত্র একটি। অতএব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আপাত প্রতীয়মান আত্মা আছেন, তিনি ঈশ্বরের ছায়া বা আকৃতি মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পশ্চাতে যিনি প্রকৃত সত্তা আছেন, তিনি সেই এক ঈশ্বর। আমরা সকলেই সেখানে এক।[২৮] ঠিক এরকম কথা ব্রহ্মসূত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"একই আত্মার ভেদ ব্যবহার উপাধিকৃত – যথা ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি।"[২৯] শঙ্করাচার্যের মতে অবিদ্যানামক আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাসকে অবলম্বন করেই আমাদের সকল প্রমাণ-প্রমেয়র ব্যবহার, লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার চলে থাকে..."[৩০] অর্থাৎ এইভাবে মায়াকে অবলম্বন করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

জীবের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আত্মার গতির কথাও বলেছেন। তিনি দেবযান ও পিতৃযান মার্গের কথা বলেছেন,

> "যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা... সূর্যলোকে উপনীত হন, তথা হতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎল্লোকে উপস্থিত হন... তাঁদের সাথে মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়, তিনি ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান... ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। ...তাঁহারা দেবশরীর লাভ করেন। ...স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। ভোগের অবসানে পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্যলোকে জন্ম হয়। ... যাঁহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। ... পুনরায়, পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে... কিছুদিন পরে আবার মানুষ হয়... সৎকার্য করিলে মানুষ স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে কৃত তাঁহার সৎকর্মের ফলভোগ করেন...।"[৩১]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে তিনি দেবযান ও পিতৃযানের কথা সংক্ষেপে বলেছেন যা প্রায় বেদান্ত দর্শনের কথা, যদিও তিনি যে তৃতীয় প্রকার গতির কথা বলেছেন তা শাস্ত্র ভিন্ন। এইভাবেই বিবেকানন্দ তাত্ত্বিক দিক থেকে কিভাবে বেদান্ত দর্শনকে বুঝেছিলেন তা বোঝা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বৈদান্তিক উপলব্ধি অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁর কাছে ব্যক্তি সামাজিক বা জৈব অর্থেই নয়, আত্মিক সত্তার অভিব্যক্তিরূপে মহিমাপূর্ণ ছিল। বেদান্তে যাকে জীবাত্মা বলা হয়, বিবেকানন্দ ব্যক্তি সেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে প্রকাশমান। ব্যক্তির কর্ম, মুক্তি অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির জন্য। কর্মের ওপর তিনি যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা তাঁর চিন্তাতেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি জগতের মূল সত্তারূপে আত্মিক ঐক্যকে স্বীকার করেছিলেন। অদ্বৈতবাদের এই মূল সূত্র বিবেকানন্দের চিন্তার ভিত্তি ছিল। অদ্বৈতবাদের সত্যর প্রবল প্রত্যয় বার বার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। জগৎ ও জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি সেই একের ইন্দ্রিয়গত প্রকাশরূপে দেখেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের কথা কোন না কোনভাবে বলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের মানবিকতাবোধ একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার মূলে বৈদান্তিক চিন্তার নতুন দৃষ্টি কম প্রভাব ফেলেনি। বিবেকানন্দের অদ্বয় উপলব্ধি মানুষমাত্রকেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আলোকিত করেছিল। মানবত্বই সত্য, জাতি ধর্ম প্রভৃতি ভেদ সেই সত্যেরই ব্যবহারিক প্রকাশমাত্র। একথা বিবেকানন্দের আগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কেউ বলেনি। মানবাত্মার অখণ্ডতা বিবেকানন্দের চিন্তাতেই অটল সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বিবেকানন্দের মুক্তির তত্ত্বেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে আত্মা নানা বন্ধনে বন্দী, অবিদ্যায় আত্মবিস্মৃত। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বাধা দূর করে ব্রহ্মের সাথে নিজেকে অভিন্ন বলে অনুভব করতে পারলেই মুক্তি। কিন্তু বিবেকানন্দ মায়ার এই জগৎকে কঠোর সত্য বলে জেনেছেন যে একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মুক্তি পেতে হলে জীবনের স্বাভাবিক কর্মবন্ধনের মোচন সূত্রে আত্মস্বরূপকে জানতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন বিশ্বজগৎ মুক্তির নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, অণু, পরমাণু সকলেই পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেছে। তাঁর সমস্ত চিন্তাতত্ত্ব ও বক্তব্যের ভিত্তি হল বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্ব। এই অদ্বৈতবোধ থেকেই কর্মের প্রেরণা, নীতির সূত্র এবং ব্যক্তির মূল্যবোধ। তবুও আমরা দেখেছি অদ্বৈতবাদ তাঁকে জীবনের প্রতি উদাসীন করেনি। মায়ার জগৎকে তিনি মুক্তির কর্মস্থলে পরিণত করেছেন কর্মেরই সাহায্যে। এটি ছিল নিঃস্বার্থ কর্ম। এই কর্মের কৌশল নিঃস্বার্থতা, এরই নাম যোগ। ব্যক্তি এই ভূমার প্রেরণাতেই কর্ম করবে। কোন কর্মে স্বার্থবোধ থাকলে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আবার কর্ম ব্যক্তিকে যখন বৃহতের অভিমুখী করে অখণ্ডতাবোধের অনুকূল করে তোলে তখন আত্মার বন্ধনদশা চলে যায়, মুক্তির পথে মানুষ অগ্রসর হয়। বিবেকানন্দের মতে স্বার্থবোধ হল অবিদ্যা। বস্তুতঃপক্ষে তিনি আত্মমুক্তির উপায়স্বরূপ কর্মকেই নির্দেশ করেছেন। কর্মের ওপর তিনি বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছিলেন। তিনি আত্মবোধকে ক্ষুদ্র অহং নয়, একরূপে ব্রহ্মের উপলব্ধিরূপেই দেখেছিলেন। সব কিছুর মধ্যেই যিনি, এক তিনিই ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশমান। বিবেকানন্দ বলেন তিনি প্রত্যয় ও বিশ্বাসরূপে প্রকাশিত। বৈদান্তিক চিন্তাতেই এর সূত্র, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যতত্ত্বে। বিবেকানন্দ এই সূত্রটিকে প্রযুক্ত করেছেন কর্মের ক্ষেত্রে আত্মপ্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য। তাই বিবেকানন্দের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ব্যক্তিত্ববাদকে সৃষ্টি করে তুলেছে। যা সর্বাত্মীয়তার উপলব্ধির ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র অধিকারকে ত্যাগ করে বৃহৎ অধিকারকে লাভ করে। বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের মতকে বেশীরভাগ স্বীকার করে নিলেও তাঁর বিচারপদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর ছিল। এদিক থেকে তিনি বেদান্তকে আধুনিক কালের নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। তাঁর এই বেদান্ত ব্যবহারিক, জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপযোগী বেদান্ত। বেদান্ত ধ্যানের জগৎ থেকে কর্মের জগতে নেমে এল, অতিলৌকিক উপলব্ধি থেকে মানব জগতের কর্মে ও প্রেমের অখণ্ড অদ্বৈত অনুভবে নবরূপান্তর লাভ করল।

বেদান্তের তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়ে নতুন যুক্তিবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হল। তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য সন্ধানের ফলে বেদান্তের একটি নতুন প্রতিষ্ঠা ঘটল। বিবেকানন্দ মনে করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পূর্ণতা আছে। সেই পূর্ণতাকে উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য।

দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ জীবকে ব্যষ্টি এবং সকলজীবের সমষ্টিকে ঈশ্বর বলেছেন এবং এই ব্যষ্টিজীব, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন একথাই বলেছেন। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের এই সত্যটি বিবেকানন্দ দেশে-বিদেশে বার বার বলেছেন। তাঁর পূর্বে এত দৃঢ়ভাবে এই কথাটি আর কেউ বলেননি। তিনি বলেছেন, "এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির মূলভিত্তি পাই,... আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না।"[৩২] "প্রকৃত পক্ষে তুমি আমি এক ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।"[৩৩] সকল জীবে নির্বিশেষ আত্মাকে যিনি দর্শন করেন — সেই দর্শনের ফলে তিনি কাউকেই ঘৃণা করেন না। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় হল শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা বহু অংশে তত্ত্বভিত্তিক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা সকলের কাছে দিয়েছেন তা তত্ত্বনির্ভর হলেও অনেক বেশি মানব অভিমুখী, সমাজ অভিমুখী। কারণ তিনি বেদান্তের তত্ত্বকে শুধুমাত্র মুমুক্ষুর মুক্তির জন্যই প্রয়োগ করতে চাননি, মানবসমাজের উন্নয়নের জন্যও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বেদান্ত দর্শন প্রচারের মাধ্যমে বৈদিক ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন, সেই ভিত্তিতে সমাজগঠন, বৈদিক ধর্ম হতে ভ্রষ্ট উচ্চবর্ণগুলিকে স্বধর্মে আনয়ন প্রভৃতি বহু সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের জীবনকে উন্নত করবার উৎসাহে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়ে বলেছেন — সকলেরই বেদান্ত অনুশীলনের প্রয়োজন আছে ও অধিকার আছে। বেদান্তের প্রধান সাধন ব্রহ্মাত্মচিন্তা, তাতে সকল স্তরের মানুষেরই অধিকার আছে, কারণ সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবে। এর দ্বারা যে যা চায় তার তাই হবে, যে মুক্তি চায় তার মুক্তিলাভ হবে। বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের অনুরূপ কঠোপনিষদে দেখা যায়। যেখানে বলা হয়েছে, 'এই যে ওঁকাররূপ অক্ষর ইহাই অপর ব্রহ্ম, ইহাই পরব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে সে তাই পায়।"[৩৪] তবে উল্লেখ্য যে শঙ্করাচার্যের মতে বেদান্তের উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও মন্দাধিকারী থাকলেও গৃহস্থেরাও বেদান্ত সাধনার মধ্যম বা মন্দ অধিকারী হলেও যাঁরা মুক্তি চায় তাঁরাই বেদান্ত সাধনার অধিকারী। অপর দিকে স্বামী বিবেকানন্দের মতে বেদান্ত সাধনার ফলে যে মুক্তি চায় তারই শুধু মুক্তি হবে। কিন্তু অপরের লৌকিক ফল হবে অর্থাৎ সে যা চাইবে সেই ফলই পাবে। এইভাবে সকল মানুষকে বেদান্ত সাধনায় নিমগ্ন করে তিনি বেদান্তের প্রয়োগাত্মক পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি দরিদ্র, অবহেলিত, মূর্খ মানুষদেরও সহানুভূতির সঙ্গে বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি যে 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করবার কথা বলেছেন, তা অদ্বৈতবেদান্তের জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানেরই ব্যবহারিক প্রয়োগ বলা যায়। এছাড়াও তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষদের মধ্যেও বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন এই কারণেই যে তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এরা সকলেই উন্নত না হলে ভারতবর্ষ উন্নত হতে পারবে না। এরা বঞ্চিত, মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন থাকার জন্যই ভারতবর্ষের পরাধীনতা, ধর্মহীনতা ঘটেছে।

পরিশেষে বলতে চাই, স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদ ও শাঙ্করভাষ্যে বর্ণিত বহু বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। তিনি সেগুলি সর্বত্র প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল বা উন্নতির পথনির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই অদ্বৈতবাদই সর্বপ্রকার ধর্ম জাতি ও সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হতে পারে। তাই মনে হয় তিনি নতুন কোন শাস্ত্র রচনা করেননি। বেদান্তের সনাতন তত্ত্বকেই তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করে তাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, তার সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ', 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৬৪।

২. 'স্বামী বিবেকন্দের বাণী ও রচনা', তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩১৮।

৩. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃ. ২২০।

৪. 'একরূপেন হ্যবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ' — ব্রহ্মসূত্র, ২/১/১১ — শাঙ্কর ভাষ্য।

৫. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৫), পৃ. ৩৮০।

৬. তদেব, পৃ. ৪০৩।

৭. বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ২৩৫।

৮. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪।

৯. "স তপস্তপ্ত্বা ইদঁ সর্বমসৃজত যদিদং কিং চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ – ২/৬।

১০. "সর্ব হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" মাণ্ডূক্যোপনিষদ-২।

১১. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১।

১২. 'ব্রহ্মসূত্র' (১/৪/২৩) — শঙ্করভাষ্য।

১৩. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।

১৪. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ণ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ (১৩৯২), পৃ. ১১২।

১৫. 'বাণী ও রচনা', সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১১১।

১৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ — ৬/৩/৩।

১৭. বেদান্তসার — ৩৪, শঙ্করাচার্য।

১৮. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬।

১৯. 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃ. ২০০।

২০. 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ৫/১৫।

২১. 'ঋগ্বেদ' – ৬/৪৭/১৮।

২২. 'বাণী ও রচনা' – দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭।

২৩. 'বাণী ও রচনা' – চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪।

২৪. 'বাণী ও রচনা'- দশম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ৩১২।

২৫. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪।

২৬. 'বাণী ও রচনা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

২৭. ‘বাণী ও রচনা’, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২।
২৮. ‘বাণী ও রচনা’, দশম খণ্ড, পৃ. ৩০৬।
২৯. ‘ব্রহ্মসূত্র’ – শাঙ্করভাষ্য, ১/২/২০।
৩০. ‘ব্রহ্মসূত্র’ ১/১/১ (অধ্যাসভাষ্য)।
৩১. ‘বাণী ও রচনা’, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৮।
৩২. ‘বাণী ও রচনা’, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।
৩৩. ‘বাণী ও রচনা’, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৭।
৩৪. “এতদ্ব্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।”
কঠোপনিষদ ১/২/১৬

লেখক পরিচিতি:

স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েশন, এম.এ., এম.ফিল. এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতে অবস্থিত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা হিসাবে নিযুক্ত। কলেজে পড়ানোর সঙ্গে সময় পেলেই বিভিন্ন ধরনের বই পড়া এবং নানান জায়গায় ভ্রমণ করা এই দুটো বিষয় খুবই প্রিয়।